بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ অক্টোবর, ২০২০ মোতাবেক ২৩ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হলো, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)। তার নাম ছিল মুআয, পিতার নাম জাবাল বিন আমর এবং মায়ের নাম ছিল হিন্দ বিনতে সাহাল্, যিনি জোহায়নাহ গোত্রের রাবাহ শাখার সদস্যা ছিলেন। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর ডাক নাম ছিল আব্দুর রহমান, তিনি খাযরাজ গোত্রের উদাঈ বিন সা'দ বিন আলী শাখার সদস্য ছিলেন। সিয়ারুস্ সাহাবার প্রণেতা লিখেন, সা'দ বিন আলীর দুই পুত্র ছিল সালেমা এবং উদাঈ। বনু সালেমা সালেমার বংশধর। ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগে উদাঈ বিন সা'দ এর বংশের কেবল দু'ব্যক্তি বাকি ছিল, একজন হযরত মুআয আর দ্বিতীয়জন তার পুত্র আব্দুর রহমান। বনু উদাঈ'র বসতি বা বাড়িঘর বনু সালেমার বসতিস্থলের পাশেই অবস্থিত ছিল। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) ছিলেন খুবই ফর্সা ও সুদর্শন, ঝকঝকে দাঁত এবং কাজলকৃষ্ণ চোখবিশিষ্ট। তিনি স্বজাতির যুবকদের মধ্যে খুবই সুদর্শন যুবক এবং অধিক দানশীল ছিলেন। আবু নঈম বর্ণনা করেন, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) আনসারী যুবকদের মধ্যে সহিষ্ণুতা, লজ্জা-সম্ভ্রম এবং উদারতায় অগ্রগামী ছিলেন। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে সত্তরজন আনসারীসহ যোগদান করেন আর ইসলাম (ধর্ম) গ্রহণ করার সময় তার বয়স ছিল আঠারো বছর। তিনি (রা.) বদর, উহুদ ও পরিখাসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেন। বদরের যুদ্ধে তিনি (রা.) তখন যোগদান করেন যখন তার বয়স ছিল বিশ বা একুশ বছর। তার বৈপিত্রেয় ভাই (অর্থাৎ এমন ভাই যাদের মা অভিন্ন কিন্তু পিতা ভিন্ন ভিন্ন) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদ্দ (রা.)ও বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। 'উসদুল গাবাহ্' অনুসারে তার বৈপিত্রেয় ভাইয়ের নাম ছিল, সাহাল বিন মুহাম্মদ বিন জাদ্দ আর সাহাল বনু সালামা গোত্রভুক্ত ছিলেন, এ কারণে বনু সালামা তাকেও নিজেদের গোত্রভুক্ত জ্ঞান করত। মুহাজিররা যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন মহানবী (সা.) মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে শুধু এই উদ্ধৃতিটিই লিপিবদ্ধ আছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বনু সালামার যুবকদের সাথে মিলিত হয়ে বনু সালামার প্রতিমা ভেঙেছিলেন। পূর্বে অপর এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল যে, তিনি কীভাবে নিজেদের পারিবারিক প্রতিমা ভেঙেছিলেন, এখানে পুনরায় বর্ণনা করছি। হযরত আমর বিন জমুহ্ তার নিজ বাড়িতেই কাঠের একটি প্রতিমা বানিয়ে তার নামকরণ করেছিলেন মানাত এবং সেটিকে তিনি খুবই সম্মান করতেন। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় বনু সালামার কতক যুবক বয়আত করে (আর) তাদের মধ্যে হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)ও ছিলেন। স্বয়ং আমরের পুত্র মুআযও বয়আত করেছিল। আমি বলেছি যে, এ ঘটনাটি ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে আর তা করা হয়েছে মুআয বিন আমর (রা.)-এর প্রেক্ষাপটে। তিনি বলেন, তিনি তার পিতা আমরকে ইসলামের দিকে ডাকার জন্য যেভাবে পরিকল্পনা করেন তা হলো, হযরত আমরের সেই প্রতিমা, যেটিকে তিনি নিজ বাড়িতে সাজিয়ে রেখেছিলেন; রাতের বেলা তুলে নিয়ে আবর্জনার স্তুপে ফেলে আসতেন আর (এ কাজে) তিনি

যেসব যুবকের সহযোগিতা নিতেন তাদের মধ্যে হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)ও ছিলেন। যাহোক, একদিন তারা (সেই প্রতিমাকে) নিয়ে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়। আমর খুঁজে বের করে সেটিকে আবার নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন আর বলেন, আমি যদি তার সম্পর্কে জানতে পারি যে আমার প্রতিমার সাথে এমনটি করছে তাহলে আমি তাকে শিক্ষণীয় শাস্তি দিব। পরের দিন সেই যুবকরা আবার সেই প্রতিমার সাথে একই আচরণ করে এবং পুনরায় প্রতিমাটি গর্তের মধ্যে উল্টো অবস্থায় পড়ে থাকে। তিনি পুনরায় সেটি উঠিয়ে নিয়ে আসেন। তৃতীয় দিন তিনি আবারও সেই মূর্তিটি পরিষ্কার করে সাজিয়ে আগের স্থানে রাখেন এবং তার গায়ে নিজের তরবারিটি ঝুলিয়ে দেন। প্রতিমাটিকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না তোমার সাথে কে এমন ব্যবহার করে। তবে এখন আমি তোমার কাছে আমার তরবারি রেখে যাচ্ছি। নিজের নিরাপত্তা বিধান তুমি নিজেই করে নিও, কেননা তোমার কাছে তরবারি আছে। পরের দিন হযরত আমর (রা.) পুনরায় দেখেন যে, মূর্তিটি স্বস্থানে নেই এবং এলাকার সেই গর্তটিতে একটি মরা কুকুরের গলার সাথে বাঁধা অবস্থায় সেটি পাওয়া যায়। এটি দেখে তিনি খুবই অবাক হন এবং একান্ত চিন্তিত হয়ে একথা ভাবতে বাধ্য হন যে, যে প্রতিমাকে আমি খোদা বানিয়ে রেখেছি, পাশে তরবারি থাকা সত্ত্বেও নিজের নিরাপত্তা বিধান করার মতো ক্ষমতাও এর নেই; তাহলে সে আমার নিরাপত্তা বিধান কীভাবে করবে? অধিকন্তু মৃত কুকুর এর গলায় বাঁধা রয়েছে; সুতরাং এটি কীভাবে খোদা হতে পারে? যাহোক, এ বিষয়টি তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত মুআয বিন জাবালের ভালোবাসা ও নিষ্ঠা কেমন ছিল তা নিম্নের ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। ঘটনাটি হলো, উহুদের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) যখন মদিনায় ফেরত আসেন, তখন শহরের অলিগলি থেকে ক্রন্দনরোল ভেসে আসছিল। তিনি (সা.) প্রশ্ন করেন, এটি কী? তিনি উত্তরে বলেন, আনসারদের নারীরা তাদের শহীদ আত্মীয় স্বজনদের জন্য আহাজারি করছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হামযা (রা.)-এর জন্য কি বিলাপ করার কেউই নেই? তিনি (সা.) হযরত হামযা (রা.)-এর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। যখন হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত সা'দ বিন উবাদা, হযরত মুআয বিন জাবাল এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.) একথা শুনে নিজ-নিজ পাড়ায় গিয়ে মদিনার বিলাপকারিণীদের একত্র করে নিয়ে আসেন এবং বলেন, এখন আনসার শহীদদের জন্য আর কেউ কাঁদবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর চাচার জন্য না কাঁদবে, কেননা তিনি (সা.) বলেছেন, মদিনায় হামযার জন্য রোদন করার কেউ নেই! এটি মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। চাচার কারণে মহানবী (সা.)-এর এত কষ্ট অনুভব হয়েছে যে, যদিও ক্রন্দন এবং বিলাপ নিষিদ্ধ, কিন্তু এখানে মহানবী (সা.) কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন অথবা মানুষের আবেগকে লক্ষ্য করে বলেন যে, হায়! যদি হামযার জন্য এমন আবেগের বহিঃপ্রকাশ হতো। কিন্তু যাহোক এমন বিলাপ করা সাধারণত ইসলামে নিষিদ্ধ। মহানবী (সা.) স্বয়ং এটি নিষেধ করেছেন।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) হুনায়েন অভিমুখে যাত্রা করেন। হুনায়েন মক্কার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত তায়েফের একটি উপত্যকা। তিনি (সা.) হযরত মুআয বিন জাবালকে মক্কাবাসীদের ধর্ম শেখানো ও কুরআন পড়ানোর জন্য নিজের অবর্তমানে মক্কায় রেখে যান।

হযরত মুআয বিন জাবাল তাবুকের যুদ্ধে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) যখন মদিনায় রয়ে যাওয়া হযরত কা'ব বিন মালেক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন বনু সালমার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে হযরত কা'ব বিন মালেকের কুৎসা করে। তখন হযরত মুআয বিন জাবাল সেই ব্যক্তিকে তিরস্কার করে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা তো

তার মাঝে ভালো গুণই দেখেছি, কোন মন্দ বিষয় তো দেখি নি। এটি ছিল উন্নত চরিত্র, অর্থাৎ কারো অবর্তমানে তার দোষত্রুটি বলে বেড়ানো সমীচীন নয়।

কাতাদা বর্ণনা করেন, আমি হযরত আনাসকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে চার ব্যক্তি কুরআন সংকলন করেছেন; তারা সবাই আনসার ছিলেন। হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত উবাই বিন কা'ব, হযরত যায়েদ বিন সাবেত এবং হযরত আবু যায়েদ। হযরত আবু যায়েদ হযরত আনাসের চাচা ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, চার ব্যক্তির কাছ থেকে পবিত্র কুরআন শিখ, অর্থাৎ ইবনে মাসঊদ, আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম, উবাই বিন কা'ব এবং মুআয বিন জাবাল-এর কাছ থেকে। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। এর পূর্বে হযরত কা'ব-এর স্মৃতিচারণেও এর কিছুটা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) পবিত্র কুরআন পড়ানোর জন্য একদল শিক্ষক নিযুক্ত করে রেখেছিলেন, যারা পুরো কুরআন মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে মুখস্ত করে লোকদের পড়াতেন। এই চারজন ছিলেন শীর্ষ পর্যায়ের শিক্ষক, যাদের কাজ ছিল মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআন শিখে মানুষকে কুরআন শেখানো। এছাড়া তাদের অধীনে এমন আরো অনেক সাহাবী ছিলেন, যারা মানুষকে পবিত্র কুরআন পড়াতেন। বিশিষ্ট এই চার শিক্ষকের নাম হলো- আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ, আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম, মুআয বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব। এদের প্রথমোক্ত দু'জন মুহাজের আর অপর দু'জন আনসার। পেশার দিক থেকে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ ছিলেন শ্রমিক, সালেম ছিলেন একজন মুক্ত ক্রীতদাস, মুআয বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব মদিনার নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মোটকথা মহানবী (সা.) সকল শ্রেণিগোষ্ঠিকে দৃষ্টিপটে রেখে সব শ্রেণিগোষ্ঠি থেকে ক্বারি বা কুরআনের শিক্ষক নির্ধারণ করেছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলতেন, 'খুযিল কুরআনা মিন আরবাআতিন, মিন আব্দিল্লাহিল মাসঊদিন, ওয়া সালেমিন ওয়া মুয়ায ইব্নে জাবালিন, ওয়া উবাই বিন কা'বিন'। অর্থাৎ যারা কুরআন পড়তে চায় তারা এই চার জনের কাছে কুরআন পড়ে নিক। তারা হলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ, সালেম, মুআয বিন জাবাল এবং উবাই বিন কা'ব। এই চারজন এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা পুরো কুরআন মহানবী (সা.)-এর কাছে শিখেছেন বা মহানবী (সা.)-কে শুনিয়ে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। এছাড়াও আরো অনেক সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে সরাসরি যতটা সম্ভব পবিত্র কুরআন শিখতেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ একবার একটি শব্দকে ভিন্নভাবে পড়লে হযরত উমর তাকে বাধা দিয়ে বলেন, এভাবে নয় বরং এভাবে পড়া উচিত। এতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ বলেন, না, আমাকে মহানবী (সা.) এভাবেই শিখিয়েছেন। হযরত উমর তাকে ধরে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেন, সে কুরআন ভুল পড়ছে। মহানবী (সা.) বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ! তুমি পড়ে শোনাও। তিনি যখন শুনালেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, সে তো ঠিকই পড়ছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! এই শব্দ তো আপনি আমাকে অন্যভাবে শিখিয়েছেন। তিনি বলেন, সেটিও ঠিক আছে। এ থেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.)-এর কাছে কেবল এই চার সাহাবীই পবিত্র কুরআন পড়তেন না বরং অন্যরাও পড়তেন। যেমন হযরত উমর (রা.)-এর এই উক্তি যে, আমাকে আপনি এভাবে পড়িয়েছেন স্পষ্ট করে, হযরত উমরও মহানবী (সা.)-এর কাছে পবিত্র কুরআন পড়তেন।

হযরত আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়ার্দ্র বা সদয় হলেন হযরত আবু বকর (রা.) আর আল্লাহর ধর্মে দৃঢ়তার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে হযরত উমর। তাদের মাঝে সবচেয়ে লজ্জাশীল হযরত উসমান এবং সবচেয়ে

উত্তম সিদ্ধান্ত দানকারী হযরত আলী বিন আবি তালেব। তাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন উবাই বিন কা'ব এবং হালাল ও হারামের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি রাখেন হযরত মুআয বিন জাবাল এবং তাদের মাঝে অবশ্যকর্তব্য বিষয়ের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি রাখেন হযরত যায়েদ বিন সাবেত। তিনি (সা.) বলেন, শোন! প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন আমীন থাকে আর এই উম্মতের আমীন হলেন, হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ। প্রায় একইভাবে এই রওয়ায়েত পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, মহানবী (সা.) বলেন, কতই না উত্তম ব্যক্তি আবু বকর, কতই না উত্তম ব্যক্তি উমর, কতই না উত্তম ব্যক্তি আবু উবায়দা বিন আল জার্‌রাহ, কতই না উত্তম ব্যক্তি উসায়েদ বিন হুযায়ের, কতই না উত্তম মানুষ সাবেত বিন কায়েস বিন শামাস, কতই না উত্তম ব্যক্তি মুআয বিন জাবাল আর কতই না উত্তম ব্যক্তি মুআয বিন আমর বিন জমুহ্‌, এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়েত।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.) একদিন তার হাত ধরে বলেন, হে মুআয! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি, হযরত মুআয (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমিও আপনাকে ভালোবাসি। তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয! আমি তোমাকে তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এই যিকির করবে আর এটিকে তুমি কখনো পরিত্যাগ করবে না, অর্থাৎ তুমি বল, 'আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরেকা ওয়া শুকরেকা ওয়া হুসনে ইবাদাতিকা'। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে তোমায় স্মরণ করা এবং তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আর সুন্দরভাবে তোমার ইবাদতের বিষয়ে আমায় সাহায্য কর। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের দ্বার সমূহের মধ্য থেকে একটি দ্বারের বিষয়ে অবগত করব না? এতে হযরত মুআয (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কেন নয়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্‌' পড়তে থাক। হযরত মুআয (রা.) রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈমান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি (সা.) বলেন, সর্বোত্তম ঈমান হলো– তুমি আল্লাহ্‌ তা'লার খাতিরে কাউকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করবে আর তুমি নিজের জিহ্বাকে আল্লাহ্‌র স্মরণে সিক্ত রাখবে। হযরত মুআয (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আর কী কী? মহানবী (সা.) বলেন, মানুষের জন্য তুমি তা-ই পছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর এবং তাদের জন্য তুমি সেই জিনিস অপছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য অপছন্দ কর।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌ (রা.) রেওয়ায়েত করেন, হযরত মুআয (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়ার পর নিজ পাড়ার লোকদের মাঝে আসতেন এবং তাদের নামায পড়াতেন। অর্থাৎ প্রথমে মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়তেন, এরপর নিজ পাড়ায় ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকদের নামায পড়াতেন। এটি বুখারীর হাদীস।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, হযরত মুআয (রা.) রসূল করীম (সা.)-এর সাথে নামায পড়তেন। এরপর এসে নিজ পড়ার লোকদের ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে এশার নামায পড়েন আর এরপর নিজের মহল্লায় ফিরে এসে তাদের ইমামতি করেন এবং এতে তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করেন। তখন এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং একা একা নামায পড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। (অর্থাৎ সে দেখে যে, দীর্ঘ সূরা পাঠ করা হচ্ছে, তাই সে সালাম ফিরিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং একা নামায পড়ে নেয়) তখন লোকজন তাকে বলে, হে অমুক! তুমি কি মুনাফেক হয়ে গেছ? অর্থাৎ তাকে তিরস্কার করে বলে, তুমি কি মুনাফেক হয়ে গেছ যে, বাজামা'ত নামায ছেড়ে দিয়ে পৃথকভাবে নামায পড়ছ?

সে উত্তরে বলে, না, খোদার কসম, আমি মুনাফেক নই। আর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আমি অবশ্যই তাঁকে জানাব যে, আমি এমনটি করেছি। মুনাফেকাত হলে তো আমি পালিয়ে যেতাম। আমি তো গিয়ে মহানবী (সা.)-কে একথা জানাব। অতএব সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা পানিবাহী উট পালন করি। অর্থাৎ উটের মাধ্যমে আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পানি নিয়ে যাই এবং মানুষের বাড়ি বাড়ি পানি সরবরাহ করি। সারা দিন পরিশ্রম করতে হয়। এদিকে হযরত মুআয (রা.) আপনার সাথে এশার নামায পড়ার পর ফিরে এসে সূরা বাকারা পড়া আরম্ভ করেছেন। আপনার সাথে নামায পড়ে তিনি আমাদের পাড়ায় এসে নামায পড়ান। অতএব মহানবী (সা.) হযরত মুআয (রা.)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে মুআয! তুমি কি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলছ? অর্থাৎ তুমি মানুষকে কেন সমস্যার মুখে ঠেলে দিচ্ছ? এগুলো পড়, অর্থাৎ এ সূরা গুলো পাঠ কর, এরপর তিনি (সা.) বলেন যে, কী পড়তে হবে। হযরত জাবের (রা.) রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.) বলেন, ওয়াশ্ শামসে ওয়া যুহাহা এবং ওয়াষ্ যুহা, ওয়াল্ লায়লে ইযা ইয়াগশা এবং সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা তিলাওয়াত কর। উদাহরণস্বরূপ তিনি (সা.) এ চারটি সূরার উল্লেখ করেন। এটি সহীহ্ মুসলিম-এর রেওয়ায়েত।

বুখারী শরীফে একটি রেওয়ায়েত এভাবেও বর্ণিত হয়েছে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী বলতেন, সামনের দিক থেকে এক ব্যক্তি পানিবাহী দুটি উট নিয়ে আসছিল আর তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে হযরত মুআয (রা.) কে নামায পড়াতে দেখে। মসজিদে নামায হচ্ছিল আর তিনি ইমামতি করছিলেন। এটি দেখে সেই ব্যক্তি তার উট বসিয়ে দিয়ে হযরত মুআয (রা.) দিকে অগ্রসর হয় আর হযরত মুআয সূরা বাকারা অথবা সূরা নিসা পড়েন; তখন সে নামায ছেড়ে চলে যায়। পরে সে জানতে পারে, হযরত মুআয (রা.) এটি অপছন্দ করেছেন। তখন উটের মালিক সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে হযরত মুআয (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। একথা শুনে মহানবী (সা.) তিনবার বলেন, হে মুআয! তুমি তো মানুষকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দাও। এত দীর্ঘ দীর্ঘ সূরা পড়ে মানুষকে কেন পরীক্ষায় ফেল? তুমি কেন 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা, ওয়াশ্ শামসে ওয়া যুহাহা, ওয়াল্ লায়লে ইযা ইয়াগশা' পড় না? কেননা তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং অভাবীরাও নামায পড়ে। আমি যেমনটি বলেছি, এটি বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত।

হযতর খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নামাযে ছোট সূরা পড়া সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-কে উপদেশ প্রদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, মহানবী (সা.) সাধারণত ফরয নামাযে সূরা আল আ'লা, সূরা আল গাশিয়া, সূরা ফজর এবং এধরনের অন্য আরো কিছু সূরা পাঠ করা বেশি পছন্দ করতেন। নাসাঈ হযরত জাবের (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) একবার নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি পিছন থেকে এসে তার সাথে নামাযে যোগ দেয়। হযরত মুআয (রা.) নামায দীর্ঘ করতে থাকেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, তিনি সূরা আলে ইমরান বা সূরা নিসা পড়তে আরম্ভ করেন। নামায দীর্ঘ হয়ে গেলে সেই ব্যক্তি তার নামায ছেড়ে দিয়ে (মসজিদের) অন্য এক কোণে গিয়ে পৃথকভাবে নামায পড়ে চলে যায়। নামায শেষ হওয়ার পর কোন এক ব্যক্তি হযরত মুআয (রা.)-এর কাছে এ ঘটনার উল্লেখ করে বলে, আপনি নামায পড়াচ্ছিলেন আর তখন এক ব্যক্তি এসে আপনার সাথে নামায শুরু করে কিন্তু আপনি যখন নামায দীর্ঘ করেন তখন সে নামায ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং এক কোণে নামায পড়ে চলে যায়। একথা শুনে হযরত মুআয (রা.) বলেন, সে (কোন) মুনাফেক হবে। পরে তিনি [অর্থাৎ হযরত মুআয (রা.) স্বয়ং] মহানবী (সা.)-এর সমীপে এ ঘটনার উল্লেখ করেন।

এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুআয (রা.) নিজে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি নামায পড়াচ্ছিলাম আর অমুক ব্যক্তি এসে নামাযে শরীক হয়, কিন্তু নামায দীর্ঘ হয়ে গেলে সে নামায ছেড়ে দিয়ে আলাদা নামায পড়ে চলে যায়। সে লোক যখন জানতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তখন সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি যখন আসি তখন তিনি নামায পড়াচ্ছিলেন আর আমি তার সাথে নামাযে যোগ দেই, কিন্তু তিনি নামায দীর্ঘ করেন। আমরা শ্রমজীবি মানুষ, আমার উটনী অভুক্ত দাঁড়িয়ে ছিল, তাই আমি নামায ছেড়ে দিয়ে মসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে নেই আর বাড়ি গিয়ে আমার উটনীকে খাবার দেই। মহানবী (সা.) এসব কথা শুনে হযরত মুআয (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে বলেন, হে মুআয! তুমি কি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলছ? তোমার 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা', 'ওয়াশ্ শামসে ওয়া যুহাহা', 'ওয়াল্ ফাজরে' আর 'ওয়াল্ লায়লে ইযা ইয়াগশা' পড়তে কী অসুবিধা ছিল? তুমি কেন এই সূরাগুলো পড়লে না, কেন দীর্ঘ সূরা পড়া শুরু করলে? এথেকে বুঝা যায়, মহানবী (সা.) এই সূরাগুলোকে মাঝারি আকারের সূরা আখ্যা দিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ দীর্ঘ সূরা পড়তে পারে, কিংবা কষ্টকর পরিস্থিতি ও অসুস্থতার সময় ছোট সূরা পড়তে পারে। কিন্তু মাঝারি আকারের সূরা সেগুলোই, যেগুলো শ্রুত তিলাওয়াত করার সময় নামাযে সাধারণত পড়া উচিত। যাহোক, এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবল এই সূরাগুলোই পড়তে হবে তা নয়। এটি হলো নীতিগত নির্দেশনা, অর্থাৎ বাজামা'ত নামাযে বেশি দীর্ঘ সূরা পড়বে না। কিন্তু পরিস্থিতি অনুসারে যার যেটি মুখস্ত থাকে অর্থাৎ কারো যদি কেবল ছোট সূরাই মুখস্ত থাকে আর ইমামতির জন্য অন্য কাউকে পাওয়া না যায় এবং তাকেই নামায পড়াতে হয়, তখন সেগুলো দিয়েও পড়ানো যেতে পারে। তবে নীতিগত নির্দেশনা হলো, বাজামা'ত নামাযে দীর্ঘ সূরা পড়ানো উচিত নয়। কেননা (নামাযে) বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকে- বৃদ্ধরাও থাকে, অসুস্থরাও থাকে এবং কর্মব্যস্ত মানুষও থাকে।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বলেন, আমি বাহনে মহানবী (সা.)-এর পিছনে বসা ছিলাম, আমার ও তাঁর (সা.) মাঝে উটের হাওদার পেছনের অংশটা ছিল। তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত আর এটি আমার সৌভাগ্য। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং আবার বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি আবারও নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত আর এটা আমার সৌভাগ্য। তিনি (সা.) আরো কিছুক্ষণ অগ্রসর হন এবং এরপর বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত আর এটি আমার সৌভাগ্য। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি জান, বান্দাদের কাছে আল্লাহ্‌র অধিকার বা প্রাপ্য কী? আমি বলি, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (সা.) বলেন, বান্দাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য হলো– আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। এরপর তিনি (সা.) আবারও কিছুদূর যাত্রা অব্যাহত রাখার পর বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি উত্তরে বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত, এটি আমার সৌভাগ্য। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি জান, আল্লাহ্‌র কাছে বান্দাদের অধিকার বা প্রাপ্য কী?' [প্রথমে আল্লাহ্‌র অধিকারের কথা বলা হয়েছে যা বান্দাদের প্রদান করতে হবে আর এখন আল্লাহ্‌র কাছে বান্দাদের অধিকার কী– তা বলছেন। অর্থাৎ বান্দা যখন নিজের দায়িত্ব পালন করবে, আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান করবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার কী প্রাপ্য।] তখন আমি বলি, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (সা.) বলেন,

বান্দাদের শাস্তি না দেয়। যারা এভাবে আল্লাহ্ তা'লার কথা মান্যকারী হয় সেই বান্দাদের অধিকার হলো, আল্লাহ্ তা'লার তাদেরকে শাস্তি না দেয়া। এটি সহীহ্ মুসলিমের হাদীস।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, এক সফরে আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। একদিন আমি তাঁর নিকটে যাই এবং আমরা দু'জন (পাশাপাশি) হাঁটছিলাম। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাকে এমন কোন কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং আমাকে আগুন থেকে দূরে নিয়ে যাবে। এতে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি অনেক বড় একটি কথা জিজ্ঞেস করেছ! (এটি অনেক বড় বিষয়) তবে এটি সেই ব্যক্তির জন্য সহজ যার জন্য মহান আল্লাহ্ সহজ করে দেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও, রমজানের রোযা রাখ এবং বায়তুল্লাহ্র হজ্জ পালন কর। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? তিনি বলেন রোযা হলো ঢাল (স্বরূপ) এবং সদকা পাপসমূহকে সেভাবে মোচন করে যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। এছাড়া রাতে উঠে নামায পড়া [অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া]। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (সূরা সাজদা: ১৭)

অর্থাৎ তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক হয়ে যায় যখন তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের প্রভুকে আহ্বান করে। আর আমরা তাদেরকে যা কিছু দান করেছি, তারা তা থেকে খরচ করে। অতএব কোন প্রাণী জানে না যে, তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ নয়নের স্নিগ্ধতা (প্রদানকারী পুরস্কাররাজি) থেকে কতকিছু গোপন করে রাখা হয়েছে।

অতঃপর তিনি বলেন, আমি তোমাদের এসবের উন্নত চূড়া এবং এর স্তম্ভ আর এর ওপরের অংশ সম্পর্কে অবহিত করব কি? তিনি বলেন, তা হলো জিহাদ। অতঃপর বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা অবহিত করব না যার ওপর এই সবকিছুর ভিত্তি? অর্থাৎ সেই মূল জিনিস যার চারপাশে এই সবকিছু প্রদক্ষিণ করে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! অবশ্যই বলুন। তখন মহানবী (সা.) নিজের জিহ্বাকে ধরে বলেন, এটিকে নিয়ন্ত্রণে রেখো। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র নবী (সা.)! আমরা এর মাধ্যমে যা বলি তার জন্য কি জিজ্ঞাসিত হব? তিনি (সা.) বলেন, তোমার কল্যাণ হোক, হে মুআয! মানুষকে তাদের জিহ্বা দ্বারা কর্তিত ফসলই লাঞ্ছিত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করে। অর্থাৎ তোমরা জিহ্বা দ্বারা যেসব কথা বল, ধারালো যেসব কথা বল, কথার মাধ্যমে দেয়া আঘাত এমন যে, তা আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত হানে, তা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এবং আরো বহু মন্দ তা থেকে উদ্ভূত হয়। অতএব এসব জিনিস, অর্থাৎ মুখ থেকে যখন মন্দ কথা বের হয় বা মুখ থেকে নিঃসৃত কথা যখন পাপের মাধ্যম হয়, তখন তা তাদেরকে লাঞ্ছিত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপকারী হয়ে থাকে। তাই জিহ্বাকে সতর্কতার সাথে ব্যবহার কর এবং এর মাধ্যমে যেন ভালো ভালো কথা বলা হয়। হযরত কা'ব বিন মালেক বলতেন, হযরত মুআয বিন জাবাল মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে মদিনায় ধর্মীয় ফতোয়া প্রদান করতেন। মুহাম্মদ বিন সাহাল বিন আবু খায়সামা নিজ পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে মুহাজেরদের মধ্য থেকে তিনজন এবং আনসারদের তিনজন ফতোয়া প্রদান করতেন, তারা ছিলেন– হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত উবাই বিন কা'ব, হযরত মুআয বিন জাবাল এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত।

আব্দুর রহমান বিন কাসেম নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন কোন বিষয়ে সুমত পোষণকারী ও ফিকাহবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করতে

চাইতেন, তখন তিনি মুহাজের ও আনসারদের ডাকতেন। অর্থাৎ হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ, হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত উবাই বিন কা'ব এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেতকে ডাকতেন। তারা সবাই হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে ফতোয়া প্রদান করতেন। অর্থাৎ তারা ইফতা কমিটির সদস্য ছিলেন অথবা তাদেরকে তিনি এই অধিকার প্রদান করেছিলেন যে, তারা নিজেদের সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে ফতোয়া দিতে পারতেন যা তারা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন। হযরত মুআয বিন জাবাল হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেন। হযরত মুআয বিন জাবাল যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তার মদিনা পরিত্যাগ করা মদিনাবাসীকে ফিকাহ্ এবং যেসব বিষয়ে তিনি ফতোয়া প্রদান করতেন সেসব ক্ষেত্রে অন্যের মুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, মানুষের তাকে প্রয়োজন, তাকে যেতে বারণ করুন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) এ বলে অস্বীকার করেন যে, যে ব্যক্তি সংকল্প বেঁধেছে এবং যে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষী, আমি তাকে বাধা দিতে পারি না। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বললাম, খোদার কসম, মানুষকে তার বিছানায়ও শাহাদত দান করা হয়। সওর বিন ইয়াযিদ বর্ণনা করেন যে, হযরত মুআয বিন জাবাল যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন তখন এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! চোখ নিদ্রিত আর তারকারাজি মিটমিট করছে। তুমি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। হে আল্লাহ! জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় এই অধম দুর্বল, আগুন থেকে পলায়নের ক্ষেত্রে আমি বল ও শক্তিহীন। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমার জন্য হেদায়েত রেখে দাও, যা কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে দিবে। নিশ্চিয় তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না। কতইনা ভয় ও ভীতির অবস্থা এটি!

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর পিছনে গদিতে হযরত মুআয আরোহিত ছিলেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত আছি। তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয! তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত আছি। তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয! তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত আছি। তিনি (সা.) এভাবে তিনবার ডাকার পর বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আগুনে যাওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ করে দিবেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.) আমি কি মানুষকে এ সম্বন্ধে সংবাদ দিব না? তারা আনন্দিত হবে, অর্থাৎ মানুষকে এই কথা অবহিত করব কি? তিনি (সা.) বলেন, তাহলে যে তারা এতেই নির্ভর করে বসে যাবে, এটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে আর অন্যান্য পুণ্যকর্ম করবে না, তাই মানুষকে এটি বলবে না। হযরত মুআয (রা.) মৃত্যুর সময় পাপ এড়ানোর ভয়ে এই কথাটি জানিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর কথা অন্যদের অবহিত করেন নি মর্মে তার চিন্তা হয় (আর তিনি ভাবেন যে,) মৃত্যুর সময় এই কথা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে আমার পৌঁছে দেয়া বাঞ্ছনীয়, এরপরই তিনি তা বলেন। কিন্তু সারা জীবনে বা সুস্থ অবস্থায় তিনি এ কথা বলেননি। হযরত ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু হাদীস উল্লেখ করতে গিয়ে উক্ত হাদীস সম্পর্কে বুখারীর ব্যাখ্যায় লিখেন, এখানে যে কথা বলা হয়েছে তা হলো, জ্ঞানগর্ভ বিশেষ কোন কথা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন; এটি যেহেতু জ্ঞানের বিষয় তাই এটিকে বিশেষ শ্রেণির মাঝেই সীমাবদ্ধ করতে হবে, কেননা সাধারণ জনগণ এর সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ নিছক এই কথা বলে দেয়া এবং অন্য কোন আমল না করা। এই কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ্' কলেমা বলাই যথেষ্ট আর কোন আমলের প্রয়োজন নেই– এমন যেন না হয়। বর্তমানে এতদসত্ত্বেও কার্যত মুসলমানদের অবস্থা এমনই। তারা নিছক নামসর্বস্ব মুসলমান; কলেমা পড়ে তারা মনে করে যে, কর্মের কোন প্রয়োজন নেই। তারপর হযরত শাহ সাহেব লিখেন, এ হাদীসটি এরূপ বিষয়াদির ধরন স্পষ্ট করে দিয়েছে। তিনি বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করছিলেন এবং এই হাদীসটিও সেসবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর তিনি লিখেন, ইমাম মুসলিমও হযরত ইবনে মাসউদের একটি রেওয়ায়েত সঠিক সনদ থেকে বর্ণনা করেন; যেখানে এই শব্দাবলী রয়েছে যে–

ما انت بمحدث قومًا حديثًا لا يبلغه عُقُولهم الا كان لبعضهم فتنة

(মা আনতা বেমুহাদ্দেসিন ক্বওমান হাদীসান লা ইয়াবলুগুহু উকূলুহুম ইল্লা কানা লেবা'যিহিম ফিতনা)

মহানবী (সা.)-এর এই কথার মর্মার্থ হলো– মানুষকে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধশক্তি অনুযায়ী সম্বোধন করা উচিত; কেননা কোন কোন কথা পরীক্ষায় নিপতিত করে। অতঃপর তিনি লিখেন, আমরা এখনও লক্ষ্য করি যে, যারা মু'মিন হওয়ার ফতোয়া বিতরন করে এমন লোকেরা কীভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ কলেমা'র নিছক মৌখিক স্বীকারোক্তিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে এবং মানবজাতিকে শরীয়তের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে তাদেরকে ঈমানের সার্টিফিকেট প্রদান করতে চায়। আর 'সিদকাম্ মিন কালবে' অর্থাৎ এর অবশ্য পালনীয় বিষয়াদির প্রতি সামান্যতম দৃষ্টি দেয় না। প্রত্যেক মৌলভী, মিম্বরে উঠে খুতবা প্রদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে যে, আমার পিছনে যে ব্যক্তি নামায পড়ছে সে কলেমা পড়ে নিলেই সার্টিফিকেট পেয়ে গেল, বাকি আর কিছুর প্রয়োজন নেই। অতঃপর তিনি লিখেন, মৌখিকভাবে স্বীকৃতিপ্রদানকারী এসব মু'মিন থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, তখন অন্তরেও ঈমান থাকবে না এবং মুখেও নয়, বরং তা থাকবে সুরাইয়া নক্ষত্রে। অর্থাৎ এখানে তিনি আখেরী জামানার কথা বলেছেন (আর তখন বলেছেন) যখন কিনা তারা (অর্থাৎ সাহাবীরা) উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি মহানবী (সা.) কলেমা পড়ার কথাটিও বলেছিলেন। অতঃপর তিনি লিখেন, **من لقى الله لا يشرك به شيئا** (মান লাকেয়াল্লাহা লা ইয়ুশরিকু বিহি শায়আ) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমৃত্যু সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে চলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মহানবী (সা.)-এর হযরত মুআয (রা.)-কে ২/৩ বার সম্বোধন করে নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া এবং এরপর একথা বলা যে নীতির অধীনে ছিল তা হলো, তিনি (সা.) তার জানার আগ্রহ এবং বাসনাকে জাগ্রত করেছেন। অর্থাৎ তিনি (সা.) যখন ২/৩ বার ডাকেন তখন সেই সাহাবী বলেন, লাব্বায়েক, জ্বি, আমি উপস্থিত রয়েছি। এভাবে তার মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং আগ্রহ সৃষ্টি হয় (তা জানার জন্য, যা) মহানবী (সা.) বলতে চাইছেন। যখন পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তখন তিনি (সা.) তাকে উক্ত কথা বলেন। অতঃপর শাহ সাহেব লিখেন, এমনটি করার উদ্দেশ্য হলো, কথা যেন ভালোভাবে মস্তিষ্কে গেঁথে যায় এবং এর প্রভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ বিষয়টিকে মনে গেঁথে দেয়ার উদ্দেশ্যেই মহানবী (সা.) তিনবার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হযরত মুআয (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর উক্ত আদেশের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি তা অবহিত করেন, যেন এমন না হয় যে, একটি অতি জরুরী বিষয় না বলার কারণে তাকে জবাবদিহি করা হবে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, তুমি একটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও তা আর কাউকে বলনি। অর্থাৎ জ্ঞানের কথা কমপক্ষে জ্ঞানী লোকদের কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত। এমনিতে তো বর্তমানে মুসলমানরা ঈমানের দাবি করে থাকে এবং কলেমা পড়েই মনে করে যে, শিরক থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছি। অথচ তাদের হৃদয় শিরকে পরিপূর্ণ, জাগতিক উপায়-উপকরণের উপরই তাদের ভরসা। তাদের আসল চিত্র যদি উদঘাটন করা হয়, তাহলে দেখা যায় বড় বড় খতিবরাও

জাগতিক উপায় উপকরণের ওপরই নির্ভর করে। পূর্বে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, কলেমা পাঠকারীদের জন্য আগুন হারাম হওয়ার যে উল্লেখ হয়েছে, তা থেকে এটিও স্পষ্ট হয় যে, এই প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লা দিবেন। এটি কোন মানুষের কাজ নয় যে, কোন কলেমা পাঠকারীর উপর ফতোয়া আরোপ করবে যে এ ব্যক্তি মুসলমান আর এ ব্যক্তি মুসলমান নয়? তাদের মনগড়া এসব ফতোয়া প্রদান কুরআনের শিক্ষারও বিরোধী। বর্তমানে মুসলমানরা রবিউল আউয়াল মাসের প্রেক্ষিতে ঘটা করে যে মিলাদুন্ নবী দিবস পালন করছে, সেক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয় হলো মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এবং আদর্শকে অবলম্বন করা। জ্ঞানের বড়াই করে কেবল নিজেদেরই মুসলমান মনে করবেন না, বরং কলেমা পাঠকারীদের বিষয় আল্লাহ্ তা'লার ওপর ছেড়ে দিন। এই বিষয়গুলোই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আত্মার জন্য আনন্দের কারণ হবে। তাঁর (সা.) উম্মতের পক্ষ থেকে আনন্দের কারণ হবে। মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের পাশাপাশি খোদা তা'লার প্রতি এ কারণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন যে, তিনি তাঁর (সা.) ধর্মকে এতীমের মতো ছেড়ে দেন নি, বরং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন যার কাজ হলো কলেমা এবং শরীয়তের বিধিনিষেধের ওপর আমল করার প্রকৃত তাৎপর্য আমাদেরকে অবহিত করা, যাতে সত্যিকারার্থে জাহান্নামের আগুন আমাদের জন্য হারাম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অমান্যকারীদেরও বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যেন তারাও এ কথা বুঝতে পারে। পাশাপাশি তিনি আমাদেরকেও প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা এবং কলেমার মর্ম বুঝার ও তার উপর আমল করার সামর্থ্য প্রদান করুন।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা তাবুকের যুদ্ধের বছর মহানবী (সা.)-এর সাথে বের হই। তিনি (সা.) নামায জমা করতেন। তিনি যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করতেন। একদিন তিনি (সা.) নামায পড়াতে কিছুটা বিলম্ব করেন। তিনি (সা.) বাহিরে আসেন এবং যোহর ও আসরের নামায জমা করেন। তারপর তিনি ভিতরে চলে যান। কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। নামায জমা করার অর্থ এই নয় যে, চার ওয়াক্তের নামায একই সাথে আদায় করতেন বরং নামায গুলোর অন্তবর্তী ব্যবধান কম হতো। হতে পারে যে, যোহরের নামায আসরের শেষ সময়ে আসরের নামাযের সাথে জমা করা হতো এবং মাগরিব ও এশার নামায মাগরিবের সময় হতেই পড়া হতো। তিনি বলেন অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, আগামীকাল তোমরা তাবুকের ঝর্ণাধারার নিকটে পৌঁছবে, ইনশাআল্লাহ্। যতক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো ভালোভাবে দেখা না যাবে তোমরা সেখানে পৌঁছাতে পারবে না, অর্থাৎ তোমরা দিনের বেলায় সেখানে পৌঁছবে আর এটি তিনি (সা.) অনুমান করে বলেছিলেন। [তিনি (সা.) বলেন] তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই সেই ঝরনার নিকট পৌঁছবে, আমি না আসা পর্যন্ত সেটির পানি যেন কেউ আদৌ স্পর্শ না করে। অর্থাৎ সেখানে পৌছে তোমরা পানি পান করবে না এবং হাত লাগাবে না যতক্ষন পর্যন্ত না আমি সেখানে পৌঁছি। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমরা সেখানে পৌঁছি, কিন্তু আমাদের আগেই সেখানে দুই ব্যক্তি পৌঁছে গিয়েছিল আর ঝরনায় প্রবহমান পানি ফিতার ন্যায় সরু ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল অর্থাৎ খুবই সামান্য মাত্রায় পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা কি এর পানি স্পর্শ করেছ বা পানি পান করোনি তো? তারা বলে হ্যাঁ আমরা সেখান থেকে পানি তুলে পান করেছি। অতপর মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে ধমক দিয়ে বলেন, আমিতো তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম, কেন তোমরা এটিতে স্পর্শ করেছো? আল্লাহ্ তা'লা যা চেয়েছেন তিনি (সা.) তাদেরকে বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকেরা সেই ঝরনা থেকে নিজেদের হাত দ্বারা অল্প অল্প করে কিছু পানি বের করেন। আর এভাবেই একটি পাত্রে কিছু পানি জমা

হয়। সত্যিকার অর্থে খুবই সরু জলধারা বইছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহানবী (সা.) পাত্রের মধ্যে দুই হাত ধৌত করেন এবং মুখও ধৌত করেন। অতঃপর সেই পানি পুনরায় ঝরনার মধ্যে ঢেলে দেন। অর্থাৎ তিনি (সা.) সেই ঝরনার পাশে বসে মুখ ধৌত করেন আর সেই পানি গড়িয়ে ঝরনার মধ্যে পড়ছিল, তখন ঝরনা দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন মুখ ও হাত ধৌত করেন এবং সেখানে পানি ঢেলে দেন তখন প্রথমে যে ঝরনা অত্যন্ত সরু ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল, তা দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে থাকে আর লোকজন তৃপ্তি সহকারে পান করতে থাকে। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, হে মুআয তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে, এই জায়গা বাগানে ভরে গেছে। হাদীসের গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় যে, এই মো'জেযা বা অলৌকিক নিদর্শন সেই সময় সংঘটিত হয়েছিল, যখন মহানবী (সা.) কেবল তবুক প্রান্তরে পৌঁছেছিলেন। সীরাত ইবনে হিশামে বর্ণিত হয়েছে যে, এই ঘটনা তবুক প্রান্তর থেকে ফিরে আসার সময় মুশাক্কাক নামক একটি উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। এই ঘটনাটি হযরত ইমাম মালেক তার হাদীস গ্রন্থ 'মুয়াত্তা'তেও বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যুরকানি এই হাদীসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, আবু ওয়ালিদ বাজী বলেন, এটি অদৃশ্যের সংবাদ যা পূর্ণতা লাভ করেছে। মহানবী (সা.) বিশেষভাবে হযরত মুআযের উল্লেখ এজন্য করেন কেননা তাঁর সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার ছিল এবং সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তিনি (সা.) ওহীর মাধ্যমের জানতে পারেন যে, হযরত মুআয এই জায়গা দেখতে পাবেন এবং সেই উপত্যকা তার (সা.)-এর বরকতে বৃক্ষরাজি ও উদ্যানসম্ভারে পরিণত হবে।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্‌র বর্ণনা করেন, ইবনে ওয়াসা বলেন যে, আমি সেই ঝরনার চতুষ্পার্শ্বের জায়গা দেখেছি, সেখানে গাছপালার সবুজ শ্যামলতা এত পরিমাণে ছিল যে, দেখে মনে হয় এই শ্যামলতা হয়ত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে আর তাঁর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণীও এমনই ছিল।

'আক্বদাস সীরাতুন্নবী (সা.)' পুস্তকে লিখা আছে যে, তবুকের শরিয়াহ্ মহকুমার প্রধান বলেন, এই ঝরনা দুই বছর পূর্ব পর্যন্ত পৌনে চৌদ্দ শত বছর যাবৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রস্ফুটিত চলে আসছে। পরবর্তী সময়ে নীচু এলাকাগুলোতে যখন টিউবওয়েল বসানো হয় তখন এই ঝরনার পানি টিউবওয়েল গুলোর দিকে নেমে যায়। কমপক্ষে পঁচিশটি টিউবওয়েলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর এই ঝরনাটি বর্তমানে শুকিয়ে গেছে। এরপর তিনি আমাদেরকে একটি টিউবওয়েলের দিকেও নিয়ে যান। আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে চার ইঞ্চির একটি পাইপ লাগানো আছে আর কোন মেশিন ছাড়াই সেটি থেকে প্রবল বেগে পানি নির্গত হচ্ছে, আর আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, পার্শ্ববর্তী অপরাপর টিউবওয়েলগুলোর অবস্থাও প্রায় এমনই। এটি মূলত মহানবী (সা.)-এর অলৌকিক নিদর্শনের কল্যাণ, আজ তবুকে এত অধিক পরিমাণ পানি মজুদ রয়েছে, মদিনা আর খায়বার ব্যতীত অন্য কোথাও এত পরিমাণ পানি আমরা দেখি নি। বরং প্রকৃত বিষয় হলো, তবুকের পানি এ উভয় স্থানের তুলনায় অধিক, সেই পানি ব্যবহার করে এখন তবুকের সর্বত্র বাগান করা হচ্ছে আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাবুক অঞ্চল বাগানে পরিপূর্ণ আর প্রতিনিয়ত তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাঁর (রা.) সীরাত বিষয়ক বাকি আলোচনা পরে হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি ঐ সকল প্রয়াত ব্যক্তিদের উল্লেখ করছি, জুমুআর নামাযের পর আমি যাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ হবে, মৌলভী ফারযান্দ খান সাহেবের, যিনি খুরুদ্দা দুনিয়াগড়, উড়িষ্যার মুবাল্লিগ ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ডায়াবেটিস এর রোগী ছিলেন। গত ১০ সেপ্টেম্বর হঠাৎ টাইফয়েড এবং প্রচণ্ড নিউমোনিয়ার কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি

করা হয় আর সেখানেই ঐশী সিদ্ধান্তের অধীনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম একজন মূসী ছিলেন। ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজনের মাঝে তার স্ত্রী সাকিনা বেগম ছাড়াও এক মেয়ে ফারিহা এবং ছেলে স্নেহের রায়হান সাহেব রয়েছেন। জামা'তের কাজে তিনি খুবই অগ্রসর ছিলেন। পরহেযগার, পুণ্যবান এবং অধীনস্ত মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লেম সাহেবদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। বিনম্র স্বভাব, সচ্চরিত্রবান, অত্যন্ত পুণ্যবান এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৯৮০ সনে তিনি কাদিয়ান জামেয়ায় ভর্তি হন এবং ১৮৮৮ সালে পাশ করে বের হওয়ার পর কর্মক্ষেত্রে যোগ দেন। খুবই পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং ওয়াকফের প্রেরণার সাথে ৩২ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সময়কালে তিনি বহু জায়গায় বয়আত করিয়েছেন এবং জামা'তও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার স্ত্রী সাকিনা বেগম সাহেবা বলেন, মৌলভী সাহেব বলতেন, তার প্রথম পোস্টিং হয় হারিয়ানায়। সেখানে নির্দিষ্ট কোন জায়গা ছিল না এবং উক্ত এলাকায় কোন আহমদীও ছিল না। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করতেন এবং তবলীগ করতেন আর সেন্টার বা পকেট বানাতেন। সেখানে থাকা অবস্থায় একবার একটি গ্রামে যান এবং গ্রামের লোকদের কাছে জামা'তের বাণী পৌঁছান। একদা সেখানকার এক স্থানীয় ব্যক্তি বলে, আমাদের মহিষ দুধ দেয় না, আপনার জামা'ত যদি সত্য হয় তাহলে আপনি পানিতে দম করে আমাকে দিন। আমি মহিষকে তা থেকে পান করাব যেন সেই মহিষ দুধ দেয়। আপনার পক্ষ থেকে যদি এই অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হয় তাহলে আমরা অর্থাৎ পুরো পরিবার বয়আত করব। মৌলভী সাহেব বলেন, আমি সূরা ফাতিহা ও দরুদ শরীফ পাঠ করি এবং কিছু দোয়া পড়ে পানিতে দম করে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দেই। সেই ব্যক্তি পানি নিয়ে চলে যায়। আমি সেই গ্রামে সারারাত অবস্থান করি। মৌলভী সাহেব বলেন, গ্রামে একটি বড় গাছ ছিল, সেই গাছের নীচে আমি সারারাত বসে ছিলাম এবং এ দোয়া করতে থাকি যে, হে আল্লাহ্! তুমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ করে দেখাও। মৌলভী সাহেব বলেন, সকাল হতেই দেখি এক ব্যক্তি বালতি নিয়ে আসছে এবং বালতিতে দুধ ছিল। সেই ব্যক্তি বলে মৌলভী সাহেব! আমাদের মহিষ দুধ দিয়েছে। আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে সে বলে, আমি ও আমার পরিবার বুঝে গেছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সত্য। তাই আমরা পুরো পরিবার সানন্দে বয়আত করছি।

তার ছেলে রায়হান বলেন, আমার পিতার মাঝে নম্রতা ও বিনয় ছিল সীমাহীন। অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। সবার সাথে ভালোবাসার আচরণ করতেন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং জামা'তের সেবার উদ্দেশ্যেই নিজ জীবন অতিবাহিত করেছেন। যুগ খলীফার প্রতিটি আদেশ ও দিক-নির্দেশনায় সাড়া দিতেন আর আমাদেরও একই উপদেশ দিতেন। আমাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ও ভালোবাসার আচরণ করতেন। জামা'তের কাজের পাশাপাশি ঘরের কাজেও অংশ নিতেন আর মাকে সাহায্য করতেন। সারা জীবন নিজের নামাযেরও সুরক্ষা করেছেন আর আমাদের নামাযেরও সুরক্ষা করিয়েছেন। আমাদেরকে সর্বদা সরল-সঠিক পথে চলার উপদেশ দিতেন। তার সাথে যতজন মুয়াল্লেম ও মুরব্বী সাহেব কাজ করতেন, তারা সবাই লিখেছেন যে, তিনি একজন আদর্শস্থানীয় মুবাল্লেগ ছিলেন এবং সুহৃদ ছিলেন আর আমরা তাকে কখনো রাগান্বিত হতে দেখি নি।

পরবর্তী জানাযা হলো আব্দুল্লাহ্ মুসিকো সাহেবের, যিনি মালয়েশিয়ার স্থানীয় মিশনারী ছিলেন। গত ৭ অক্টোবর তারিখে অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়, কিন্তু আরোগ্য লাভ হয় নি এবং ঐ রাতেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। স্ত্রী ছাড়াও তিনি আটজন সন্তান রেখে গেছেন। মালয়েশিয়ার দুজন মুরব্বী সালাহ্উদ্দীন সাহেব ও মসরূর আহমদ সাহেবের শ্বশুর ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ মুসিকো সাহেব ফিলিপাইনে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের

পড়ালেখা শেষ করার পর মুসলিম সংগঠন মোরু ন্যাশনাল লিবারেল ফ্রন্টে যোগদান করেন। এই সংগঠন সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল যার উদ্দেশ্য ছিল ফিলিপাইনে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭৩ সনে তার পিতামাতা হিজরত করে ফিলিপাইন থেকে মালয়েশিয়া চলে আসেন এবং সুন্দাকুন সুবাতে বসবাস শুরু করেন। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তাকে পুণ্যাত্মা দিয়েছিলেন। কয়েকবার তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খলীফাতুল মসীহ্ সানী এবং খলীফাতুল মসীহ্ সালেসকে স্বপ্নে দেখেন। খোদার ইচ্ছায় ১৯৭৩ সনে তিনি তাকিনা বালুর জলসা সালানায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান। সেখানে জলসার সব কার্যক্রম তার ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয় এবং তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। সুন্দাকুন-এ তিনি যেখানে থাকতেন সেখানে কোন মুবাল্লেগ ছিল না, আর তিনি ছিলেন এক তৃষ্ণার্ত আত্মা। সুতরাং সেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তিনি জামা'তের পুস্তকাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তবলীগের খুব আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহকে তিনি বাস্তব রূপ দেন আর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং নিজ এলাকায় অনেক তবলীগ করেন। এর ফলে বহু লোক আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তার তবলীগের আগ্রহের কারণে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন এবং তাকে মুবাল্লেগ হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়। একইভাবে তিনি কয়েক বছর ফিলিপাইনে খায়রুদ্দীন বারুস সাহেবের সাথেও কাজ করার সুযোগ পান। তার পবিত্র স্বভাব, শিক্ষানুরাগ, বিনয়, দ্বীনতা ও খোদাভীতির কারণে তিনি সেখানেও অনেক কাজ করেন এবং খ্রিষ্টানদের সাথেও ধর্মীয় বিতর্ক করতেন আর বেশ কয়েকজনকে ইসলামের ক্রোড়ে নিয়ে আসেন। উর্দূ বলতে পারতেন না, কিন্তু শেখার আগ্রহ ছিল। বেশকিছু উদ্ধৃতি মুখস্ত ছিল, নযম মুখস্ত ছিল। অতিথি পরায়ণতার খুব আগ্রহ ছিল। বিশেষভাবে জুমুআতে আগতদের আতিথেয়তা করতেন। সুশৃঙ্খল মানুষ ছিলেন। তিনি চাইতেন, প্রত্যেকে যেন সুশৃঙ্খল থাকে এবং তদনুযায়ী তরবিয়ত করতেন। কয়েক বছর যাবত চলাফেরার সমস্যা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো নিজের এ কষ্টকে নিজের কাজে বাধ সাধতে দেন নি।

তৃতীয় জানাযা কাদিয়ানের মুয়াল্লেম সিলসিলা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের, যিনি ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে ছাপ্পান্ন বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি এক খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার বংশে সর্বপ্রথম বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন তার বড় ভাই, যিনি অবসরপ্রাপ্ত মুয়াল্লেম ছিলেন। এরপর পুরো পরিবার বয়আত করে। আহমদীয়াত গ্রহণের পর মরহুম জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন-এ ত্রিবর্ষীয় কোর্স করেন। সেখান থেকে পাশ করে বিভিন্ন এলাকায় তবলীগের জন্য যান। কাদিয়ানের বিভিন্ন এলাকাতেও তালীম ও তরবিয়তের দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়। অত্যন্ত অনুগত ছিলেন এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন। তবলীগে ভালো দক্ষতা রাখতেন। তার মাধ্যমে কাদিয়ানের তিনটি খ্রিষ্টান ও তিনটি অ-আহমদী পরিবার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের মধ্য থেকেও দুই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ফযলে ওসীয়্যতকারী। অর্থাৎ শুধু অন্তর্ভুক্তই হন নি, বরং পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামীও হয়েছেন। তার পরিবারে তিনি একজন পুত্র ও দুইজন কন্যা রেখে গেছেন। তার পুত্র এ বছর জামেয়া পাশ করে মুরব্বী হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা সব মরহুমদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সন্তানদেরকে তাদের পুণ্যকর্ম ধরে রাখার সামর্থ্য দিন। আল্লাহ্ তা'লা করুন তাদের ইচ্ছানুসারে যেন তাদের সন্তানদের তরবিয়ত হয়। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন সন্তান ওয়াকফে জিন্দেগী রয়েছে, তারা খিলাফতের সত্যিকার সুলতান (তথা সাহায্যকারী) হোক। আমি যেমনটি বলেছি, জুমুআর নামাযের পর আমি তাদের জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)